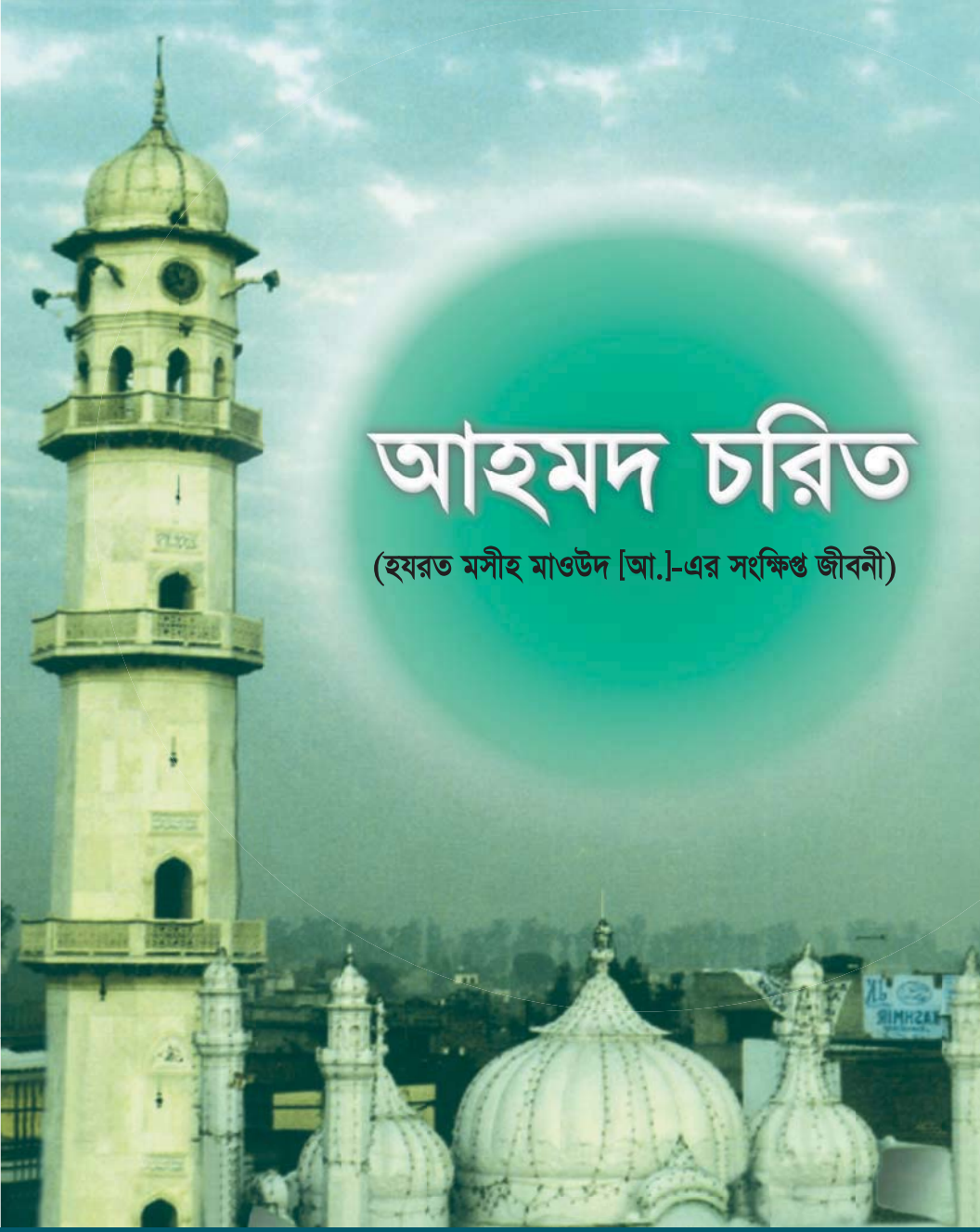

আহমদ চরিত

(হযরত মসীহ মাওউদ [আ.]-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা

আহ্‌মদ চরিত

(হযরত মসীহ মাওউদ [আ.] এর সংক্ষিপ্ত জীবনী)

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.)
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক | **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল | ৯ই আগস্ট, ১৯৮৯
মে ২০০৯

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **বাড-ঔ-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

AHMAD CHARIT | Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুখবন্ধ

আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বিজয় শতাব্দীতে এই ঐশী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর জীবনাদর্শ নিয়ে নানা গবেষণা চলছে– অ-আহমদী সমাজেও দিন-দিন এই মহাপুরুষকে জানার আগ্রহ বাড়ছে। জামাতের অভ্যন্তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জীবন চরিত জানানোর জন্য সহজপাঠ্য এই বইখানি অতুলনীয়। আকারে ছোট্ট হলেও সংক্ষেপিত বইটি এই মহান ব্যক্তিত্বের বিস্তারিত জীবনী পড়ার সাধকে আরো অদম্য করে তুলবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বিস্তারিত জীবন 'হায়াতে তাইয়্যেবা' নামে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আহমদ চরিত কিতাবখানি সাধু থেকে চলিতরূপ দান ও প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়। বইটিকে প্রকাশনায় আরো ভূমিকা রেখেছেন জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেব। মহান আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। হুয়ান নাসের।

মোবাশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

ঢাকা
১৪ এপ্রিল, ২০০৯ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

দু'টো কথা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচার কাজ যতই প্রসার লাভ করছে স্বাভাবিকভাবে জনগণের মনে ততই এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম (আ.) এর জীবনী সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বেড়ে চলেছে। এটা খুবই কাম্য ও শুভ লক্ষণ। এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাবার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত 'আহমদ-চরিত' পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কর্তৃক রচিত 'আহমদ-চরিত' পুস্তকের বঙ্গানুবাদের সার সংক্ষেপরূপে এটি তৈরী করেছেন জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান।

তাঁর ও এ পুস্তক প্রকাশনার সাথে জড়িত সবার জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমীন।

বিনীত

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

২৫ শে শ্রাবণ, ১৩৯৬
৯ ই আগস্ট, ১৯৮৯

সূচীপত্র

(যে বিষয়গুলো এ পুস্তকে আলোচিত হয়েছে)

১। জন্ম ও বংশ পরিচয় -১
২। শিক্ষাকাল -৩
৩। জীবন পথে -৩
৪। ধর্ম জীবন -৫
৫। ইসলাম প্রচারে আহমদ (আ.) -৮
৬। লাহোর সর্ব ধর্ম সম্মেলন -১১
৭। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা -১৩
৮। ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমা -১৪
৯। তাঁর জীবনের আরও কিছু ঘটনা -১৫
১০। ইন্তেকাল -২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আহমদ চরিত

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। তিনি ১৮৩৫ খৃস্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পাঞ্জাবের (ভারত) গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সাথে এক জমজ বোনেরও জন্ম হয়। কিন্তু বোনটি জন্মের পর-পরই মারা যান।

তাঁর পিতার নাম মির্যা গোলাম মর্তুজা। তাঁর এক পূর্ব পুরুষের নাম বরলাস। তিনি ছিলেন সম্রাট তৈমুরের পিতৃব্য। তৈমুর তাঁর রাজ্য করতলগত করে নিলে তিনি সপরিবারে খোরাসানে চলে যান। ষোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের মির্যা হাদী বেগ নামক এক ব্যক্তি নানা কারণে দেশ ত্যাগ করে দুইশ' অনুচরসহ হিন্দুস্থানে আসেন। তিনি বিপাসা নদীর তীর হতে ৯ মাইল দূরে একটি গ্রাম স্থাপন করেন এবং এর নাম রাখেন ইসলামপুর। তাঁকে দিল্লীর বাদশাহ কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। তখন থেকে এই গ্রামটি ইসলামপুর কাজী (অর্থাৎ- ইসলামপুর, যেখানে কাজী বাস করেন) নামে অভিহিত হতে থাকে। কালক্রমে, এই নাম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে শুধু কাজী এবং আরও পরে কাদি এবং অবশেষে কাদিয়ান নামে রূপান্তরিত হয়।

শিখ জাতির অভ্যুত্থানের ফলে, এই বংশের অধিকারভূক্ত স্থানগুলি ক্রমাগত হস্তচ্যুত হয়ে যায়; অবশিষ্ট থাকে শুধু কাদিয়ান ও তার পার্শ্ববর্তী শস্য প্রান্তর। (বিস্তারিত জানতে চাইলে স্যার নেপেল গ্রেফিন লিখিত 'দি পাঞ্জাব চিফস' গ্রন্থটি পাঠ করুন)।

পরবর্তীকালে মির্যা গোলাম মর্তুজা তাদের পূর্ব জায়গীরের কয়েকটি গ্রাম

পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাঁকে রাজা রণজিৎ সিং এর অধীনেও সৈনিকের কাজ করতে হয় এবং সেজন্য তিনি খুব সম্ভ্রমও লাভ করেন। কিন্তু শিখরাজ্য পতনের পর তাঁর সমস্ত জায়গীর পুনরায় বাজেয়াপ্ত হয়। শত চেষ্টা-তদ্‌বীর ও অজস্র টাকা পয়সা খরচ করা সত্ত্বেও তিনি হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেননি। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা সাহেব (আ.) তাঁর এক পুস্তকে লিখেছেন:

"আমার ওয়ালেদ (পিতা) সাহেব তাঁর এই অকৃতকার্যতার দরুন সর্বদাই বিষন্ন মনে থাকতেন। ... তিনি তখনও কয়েকটি গ্রামের মালিক ছিলেন এবং ইংরেজ সরকার থেকে পেনশন পেতেন। তবুও, তিনি যা হারিয়েছিলেন তার তুলনায় এগুলোকে অতি সামান্য বিবেচনা করে সর্বদাই দুঃখে ম্রিয়মান থাকতেন এবং বলতেন: আমি এই নাপাক দুনিয়ার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি তা যদি ধর্মের জন্য করতাম, তাহলে হয়ত আজ আমি একজন ওলী বা কুতুব হতে পারতাম।"

তিনি প্রায়ই একটি ফার্সি বয়েত আবৃত্তি করতেন, যার অর্থ:

'জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; এখন সামান্যই বাকী আছে। যদি কয়েকটি রাতও তাঁর চিন্তায় কাটাতে পারতাম ভাল হতো।' হযরত মির্যা সাহেব (আ.) তাঁর পিতার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা থেকেই প্রতীয়মান হয়, খোদাতায়ালা তাঁর বাল্য ও যৌবনকাল এমনভাবে গঠন করেছিলেন যার ফলে সংসারের প্রতি আসক্তি তাঁর মনে কখনও জাগরিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। তাঁর জীবনী লেখক শেখ ইয়াকুব আলী তোরাব (রা.) লিখেছেন: 'যখন তাঁর বয়স নিতান্ত অল্প, তখন তিনি তাঁর সমবয়স্কা একটি বালিকাকে (যার সাথে পরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল) বলতেন 'আমার জন্য দোয়া কর, যেন আমার নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়।'

এই ছোট্ট কথাটি থেকেই বুঝা যায়, এই বালকের দ্বারা পৃথিবীর যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে, সেজন্য খোদাতায়ালা তাঁকে প্রস্তুত করছিলেন।

শিক্ষাকাল

হযরত মির্যা সাহেব যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে পাঞ্জাব তথা সারা হিন্দুস্থানে লেখাপড়ার বড় একটা চর্চা ছিল না; এমনকি চিঠি পড়ার লোকও পাওয়া দুষ্কর ছিল।

তিনি প্রথমে ফযল ইলাহী নামক একজন শিক্ষকের কাছে কুরআন শরিফ ও কয়েকটি ফার্সি কিতাব পাঠ করেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি ফযল আহমদ নামক এক শিক্ষকের কাছে আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। তারপর ১৭/১৮ বৎসর বয়সে তিনি মৌলবী গোলাম আলী সাহেবের কাছে পুনরায় আরবি ব্যাকরণ পাঠ করেন এবং সেই সাথে ন্যায় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের কিছু গ্রন্থাদিও অধ্যায়ন করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন অভিজ্ঞ হেকিম। তাঁর কাছেও তিনি কয়েকটি চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করেন। এছাড়া, পিতার যে লাইব্রেরি ছিল তাতে নানা ধরনের পুস্তক পাঠে তিনি দিনরাত অতিবাহিত করতেন। পাছে তাঁর স্বাস্থ্য হানি ঘটে বা তিনি সংসারবিমুখ হয়ে পড়েন, এই আশঙ্কায় পিতা মাঝে-মধ্যেই তাঁকে তাঁর এই লেখাপড়ার কাজে বাধা দিতেন।

জীবন পথে

সিপাহী বিপ্লবের অবসানের পর পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ভারতবাসীরাও ইংরেজের অধীন চাকুরী করাকে সম্মানের চোখে দেখতে থাকেন। মির্যা সাহেব পিতার উদ্যোগে সিয়ালকোট ডিপুটি কমিশনারের অফিসে একটা চাকুরীতে নিযুক্ত হন। সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২২ বৎসর। তিনি অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতেন এবং বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দান করতেন। তিনি এত ধর্মভীরু ছিলেন যে, বয়োবৃদ্ধ লোকেরাও তাঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন।

সেই সময়ে খৃস্টান মিশনারিদের ভয়ানক আক্রমণে মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

পড়েছিল। তারা পাদ্রীদের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতো না। কিন্তু মির্যা সাহেবের সঙ্গে তর্কে পাদ্রীরা বরাবরই হার মানতে বাধ্য হতো; এজন্য পাদ্রীদের মধ্যেকার গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে শ্রদ্ধা করতেন। এই শ্রেণীর একজন উচ্চ পদস্থ পাদ্রী ছিলেন রেভারেন্ড বাটলার এম. এ. সাহেব।

চাকুরীতে মির্যা সাহেব নিতান্ত বীতস্পৃহ ছিলেন। পিতা তাঁকে চাকুরী থেকে নিয়ে এসে জমিদারী পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করেন। কিন্তু এ কাজেও তাঁর কোন অনুরাগ দেখা গেল না। মামলা-মোকদ্দমায় হেরে তিনি প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফিরতেন। এতে লোকে তাঁকে তাঁর আনন্দের কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলতেন 'আমার যতদূর সাধ্য করেছি; আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল, হয়েছে। মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, এখন নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র নাম নিতে পারবো।' এজন্য অনেক সময় তাঁকে পিতা ও ভাইয়ের ভর্ৎসনা সহ্য করতে হতো। পিতা সবসময় পুত্রকে অধ্যায়নে রত থাকতে দেখে 'মোল্লা' বলে বিদ্রূপ করতেন এবং বলতেন, 'আমার বংশে এই মোল্লার উদ্ভব হল কিসে।' অবশ্য, পিতা যে সবসময়ই পুত্রের এই ধর্ম-কর্মের প্রতি আসক্তিকে অবহেলা করতেন এমন নয়। নিজের সংসার জীবনের বিফলতার কথা স্মরণ করে তিনি বলতেন; আসলে, কাজ আমার এই পুত্রই করছে। অনেক সময় পিতার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেও তিনি পিতাকে কুরআন হাদিসের কথা শোনাতেন। একবার কপুরথলা রাজদপ্তরে তাঁকে শিক্ষা বিভাগে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। ফলে পিতা অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হন। পিতার সেই মনোকষ্ট দেখে তিনি মনে-মনে প্রতিজ্ঞবদ্ধ হন, যতদিন পিতা বেঁচে থাকবেন, ততদিন সাধ্যমত বৈষয়িক কাজে তাঁর সহায়তা করবেন।

এই সময়ে হযরত আহমদ যদিও পিতার কাজে নিয়োজিত থাকতেন, তবুও তাঁর মনের গতি ধাবিত ছিল বিপরীত দিকে। যেমন কথায় বলে- 'দাস্ত বা কার দিল বা ইয়ার'; 'হাত কাজে মন বন্ধুর পানে।' নামাযে তাঁর কখনই ব্যতিক্রম হত না। একবার একটি গুরুতর মামলার শুনানীর সময় নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি শুনানী ছেড়ে নামায পড়তে যান। ইতোমধ্যে আদালতে তাঁর ডাক পড়ে। কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে নামায আদায় করেন। তিনি

ভেবেছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধেই হয়তবা রায় হয়ে গেছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, রায় তাঁরই পক্ষে হয়েছে। বিচারক ছিলেন একজন ইংরেজ, তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতেই নথি-পত্র পরীক্ষা করে দেখে তাঁর পক্ষেই রায় দিয়েছেন। এভাবে খোদাতায়ালাই তাঁকে সাহায্য করেছিল।

আহমদের মন দুনিয়ার প্রতি বিমুখ ছিল। নির্জনতা তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কিন্তু তিনি অলসবা শ্রম বিমুখ ছিলেন না। বস্তুত, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি দূর-দূর পথ হেঁটেই অতিক্রম করতেন। কদাচিৎ অশ্বারোহণে যেতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রায় প্রত্যহ ৫/৭ মাইল খোলা বাতাসে ভ্রমণ করতেন।

ধর্ম জীবন

১৮৭৫ সন। আহমদের বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর। এই সময়ে তাঁর পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। পিতার অসুস্থতা সম্পর্কে তিনি আল্লাহতায়ালার এক বাণী (ইলহাম) প্রাপ্ত হনঃ "আত্তারেকু ওমাত্তারেকু"। অর্থাৎ, 'রাত্রিকালে আগমনকারীর শপথ, তুমি কি জান রাত্রিকালে কি আসবে?' তিনি বুঝতে পারলেন এই ইলহামের দ্বারা তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হচ্ছে; যা সন্ধ্যার পরে সংঘটিত হবে। এই ঘটনার পূর্বে তিনি অনেক দিন যাবত নানা প্রকার সত্য-স্বপ্ন দেখে আসছিলেন এবং সেগুলির মধ্যেকার নানা ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ হতেও দেখেছেন অনেকেই। কিন্তু এবারেই তিনি সর্বপ্রথম ইলহাম বা ঐশীবাণী লাভ করলেন। যাহোক পিতার মৃত্যু-সংবাদে তাঁর মন শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। তাঁর মনে এই চিন্তারও উদ্রেক হয়, পিতার অবর্তমানে তাঁর কিভাবে জীবিকা নির্বাহ হবে! কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রতি আরও একটি ইলহাম অবতীর্ণ হয়ঃ 'আলায় সাল্লাহু বি কাফিন আবদাহু?'- 'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?' এই ইলহাম তাঁর মনে সান্ত্বনা ও পরম শান্তি দান করে। তিনি তখনই এই ইলহাম কাগজে লিখে রাখেন এবং এই ইলহাম- লিখা আংটি তৈরী করালেন। তিনি এই কাজে এই কারণে একজন হিন্দু ভদ্রলোক নিযুক্ত করেছিলেন, সেই

ভদ্রলোক যেন পরবর্তীকালে একজন নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে গণ্য হতে পারেন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর বড় ভাই (এবং একমাত্র ভাই) তাঁকে পিতৃসম্পত্তি থেকে যা কিছু দিতেন, তাই তিনি সাদরে গ্রহণ করতেন। শুধু আহার্য ও পরিধেয় বস্ত্র পেলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু, ঘোর সংসারী বড় ভাই ছোট ভাইয়ের সংসার বিরাগী ভাব পছন্দ করতেন না। মনে করতেন, এই বৈরাগ্য তাঁর আলসেমী ছাড়া আর কিছুই নয়। বলতেন, আহমদ কাজের কাজ তো কিছুই করবে না, শুধু ঘরে বসে-বসে পুস্তক আর খবরের কাগজ পড়ে সময় নষ্ট করবে। বড় ভাইয়ের অনুপস্থিতে তাঁর কর্মচারীরাও আহমদকে নানা প্রকার মনঃপীড়া দিত।

এই সময়ে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে চিত্তশুদ্ধির জন্য তিনি রোযা রাখার আদেশ পান এবং ক্রমাগত ৬ মাস ধরে অনবরত রোযা রাখেন। অনেক সময় বাড়ি থেকে মসজিদে তাঁর জন্য যে খাবার পাঠান হত তিনি তা দীন-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন। কোন-কোন দিন রোযা খুলে খাবার চেয়ে পাঠালে স্পষ্ট মানা করে দেয়া হত; শুধু পানি বা সামান্য কিছু খেয়েই পরদিন তিনি আবার রোযা রাখতেন। তাঁর স্বভাবই ছিল তাঁর খাদ্য-দ্রব্য গরীব মিস্‌কীনদের মধ্যে বিতরণ করা। ফলে দুই ভাইয়ের মজলিস ছিল দুই রকমের। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মজলিস থাকত সর্বদা পানাহার ও আমোদ-আহ্লাদে মুখরিত; আর কনিষ্ঠের মজলিসে থাকত একদল সহায়-সম্বলহীন নিরুপায় কাঙাল মানুষ।

এই সময় থেকে হযরত আহমদ ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। খৃস্টান ও আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে তিনি পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠাতে শুরু করেন। ফলে, তিনি ক্রমাগত প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকেন। তখন থেকে তিনি আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে বাণী বা ইলহাম দ্বারা অনুগৃহীত হতে থাকেন এবং আল্লাহতায়ালার আদেশের অনুবর্তী হয়ে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "বারাহীনে আহমদীয়া" প্রণয়নের কাজে হাত দেন। এই গ্রন্থের ১ম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সালে, ২য় খন্ড ১৮৮১ সালে, ৩য় খন্ড ১৮৮২ সালে এবং ৪র্থ খন্ড ১৮৮৩ সালে। তিনি একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করেন, এই গ্রন্থে তিনি ইসলামের সত্যতার যে প্রমাণাদি পেশ করেছেন, যদি অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের কেউ তার নিজ ধর্ম থেকে অনুরূপ প্রমাণাদি, বা তার অর্ধেক বা

এক-চতুর্থাংশ প্রমাণও পেশ করতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি (তৎকালীন মূল্য অন্যূন দশ হাজার টাকা) সেই ব্যক্তিকে পুরস্কার স্বরূপ দান করবেন। যাহোক, এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাবেন বলে মনস্থ করলেও তিনি মাঝখানে থেমে যান। কারণ, আল্লাহতায়ালা তাঁকে ইসলামের খেদমতে আরও অন্যান্য কাজ করার জন্য আদেশ দান করেন। তবুও তিনি যা লিখেছেন তাই সারা জগতের দৃষ্টি খোলার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা একবাক্যে স্বীকার করে। শত্রুপক্ষের কেউ-ই এই গ্রন্থের উত্তর লিখতে সমর্থ হয়নি। মুসলমানরা আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে। তাঁকে যামানার মুজাদ্দেদ বলে প্রচার করতে থাকে; যদিও তখন পর্যন্ত তিনি তেমন কোনও দাবি করেননি। আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের নেতা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী তাঁর পত্রিকায় "বারাহীনে আহমদীয়া" সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তের শত বৎসরের মধ্যে ইসলামের খেদমতে এরূপ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এই গ্রন্থে হযরত আহমদ তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কতিপয় ইলহাম লিপিবদ্ধ করেন। এই ইলহামগুলির ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বে সুস্পষ্টরূপে পূর্ণ হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। যেমন:

"দুনিয়াতে একজন সতর্ককারী এসেছে। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করেনি; কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং অতি প্রচন্ড আক্রমণসমূহ দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রকাশিত করবেন।"

"দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে সাহায্য-সামগ্রী আসবে; সুদূর পথ অতিক্রম করে দলে-দলে লোক আসবে।"

"বাদশাহ্‌গণ তোমার বস্ত্রাদি থেকে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে।"... ইত্যাদি।
এই সকল ইলহাম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সনে। আজ পৃথিবীর শতাধিক দেশে জামা'তে আহমদীয়ার কেন্দ্র ও মিশন স্থাপিত হয়েছে। "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছাব।" এই ইলহামও, যা তাঁর রূহানী জীবনের প্রারম্ভে অবতীর্ণ হয়েছিল তা-ও অক্ষরে-অক্ষরে পূর্ণ হয়ে চলেছে। "বারাহীনে আহমদীয়া" প্রকাশিত হওয়ার পর সারা হিন্দুস্থানে তাঁর সুখ্যাতি বিস্তার লাভ করে। আরও পরে এই গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিরুদ্ধবাদী

লেখক এইচ. এ. ওয়াল্টার লিখেছেন:

"The book was quite universally acclaimed (in so far as it was read) throughout the Mohammedan world, as a work of power and originality." (H. A. Walter: The Ahamadiyya Movement, page 16).

১৮৮৪ সনে হযরত আহমদের নিঃসন্তান বড় ভাই মারা যান। আইনত প্রায় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হলেও তিনি তাঁর ভ্রাতৃবধুর অনুরোধে ভাইয়ের পালিত পুত্রের নামে অর্ধেক সম্পত্তি দান করেন। বাকী অর্ধেক সম্পত্তিও বহুদিন যাবত আত্মীয়-স্বজনের ভোগ দখলে থাকে। ভ্রাতৃবিয়োগের দেড় বৎসর পরে আল্লাহতায়ালার আদেশে তিনি দিল্লীতে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তখন তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তে প্রসার লাভ করছিল। এই সময়ে জম্মু মহারাজার রাজ-চিকিৎসক অনন্য-সাধারণ প্রতিভাময় পন্ডিত ও প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ হযরত আলহাজ মাওলানা নুরুদ্দীন সাহেবও (রা.) তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এই ভক্তদের কেউ-কেউ হযরত আহমদের হাতে দীক্ষা নিতে চাইলে তিনি (আ.) দীক্ষা দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। বলতেন- 'আমার সকল কাজ খোদার হাতে ন্যস্ত, তাঁর বিনা হুকুমে কিছু করতে পারব না।'

ইসলাম প্রচারে আহমদ (আ.)

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁর প্রতি ইলহাম বা ঐশীবাণীযোগে বয়াত বা দীক্ষা দান করার আদেশ অবতীর্ণ হয়। ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে লুধিয়ানায় নয়ীমহল্লায় মিঞা আহমদজান নামক একজন নিষ্ঠাবান শিষ্যের বাড়িতে তিনি বয়াত গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম বয়াত করেন হযরত মৌলানা হাকিম নুরুদ্দীন সাহেব (রা.)। সেদিন প্রায় ৪০ জন লোক বয়াত গ্রহণ করেন। পরে ধীরে-ধীরে এই বয়াতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে তাঁকে আল্লাহতায়ালা ইলহামযোগে জানান, বনী ইসরাইলী নবী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পৃথিবীর বুকে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের

প্রচলিত যে বিশ্বাস, তা অলীক; পৃথিবীতে তাঁর প্রত্যাগমন অসম্ভব। হযরত ঈসা (আ.) এর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমনের অর্থ– তাঁরই গুণে গুণান্বিত আর একজন মহামানবের আবির্ভাব ঘটাবেন আল্লাহতায়ালা এবং সেই প্রতিশ্রুত পুরুষ তিনি নিজেই। তিনিই (অর্থাৎ, হযরত আহমদ-ই) সেই দ্বিতীয় ঈসা (আ.)। এই সংবাদ জগতের সামনে ঘোষণা করার জন্য তিনি বারবার ইলহামযোগে আদিষ্ট হতে থাকলেন। তিনি বাড়িতে বলে দিলেন, তাঁর প্রতি এমন এক কাজ সমর্পণ করা হয়েছে যে, এখন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচন্ড শত্রুতা শুরু হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি লুধিয়ানায় গমন করেন এবং ১৮৯১ খৃস্টাব্দে ইশতেহার দ্বারা নিজেকে মসীহ মাওউদ [অর্থাৎ প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ (আ.)] বলে জনসাধারণ্যে ঘোষণা করেন।

এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়া মাত্রই সারা ভারতে এক তুমুল আন্দোলন শুরু হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার তুফান বইতে লাগল। এতদিন যে সব আলেম তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, এখন তারাই তাঁর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়ে গেলেন। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী কয়েকজন আলেম সহ লুধিয়ানায় আগমন করেন এবং হযরত আহমদকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। তিনিও সম্মত হন। কিন্তু বিরুদ্ধাবাদীরা এমন সব কূটতর্কের অবতারণা করলেন যে, আসল বিষয়ের মীমাংসা কিছুই হল না। বিরুদ্ধবাদীরা দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম করছে দেখে ডেপুটি কমিশনার তাদেরকে লুধিয়ানা ত্যাগের নির্দেশ দেন। অনুরূপ আদেশের আশংকায় হযরত আহমদও অমৃতসরে চলে যান। কিন্তু অনুরূপ কোন আদেশ তাঁর প্রতি না হওয়ায় তিনি পুনরায় লুধিয়ানায় ফিরে যান এবং সপ্তাহ খানেক পরে কাদিয়ানে চলে আসেন। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দিল্লী যান। দিল্লীতে উত্তেজনার বাতাস বইতে লাগল। সে সময় আহলে হাদিস আলেমদের ওস্তাদ ছিলেন মৌলানা নযীর হোসেন সাহেব। তাঁরই সাথে বাহাস বা বিতর্ক হবে বিখ্যাত জামে মসজিদে। এই সিদ্ধান্তটা বিরুদ্ধবাদীরা নিয়েছিল একতরফাভাবেই। তারা না শান্তি-শৃংখলা রক্ষার কোন বন্দোবস্ত করেছিল, না বাহাসের বিষয়াদি ও শর্তাবলী স্থির করেছিল।

যাহোক, হযরত আহমদ বললেন "যদি মৌলানা নযীর হোসেন সাহেব কসম করে বলতে পারেন, কুরআন শরিফের কথা অনুযায়ী হযরত ঈসা মসীহ আজও

জীবিত আছেন এবং এখনও তাঁর মৃত্যু হয়নি এবং যদি তার এই মত প্রকাশের পর এক বৎসরের মধ্যে তার উপরে আল্লাহর আযাব নাযিল না হয়, তাহলে আমি নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করবো এবং আমার লিখিত সমস্ত কিতাবপত্র আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলবো।" জামে মসজিদে হাজার-হাজার উত্তেজিত মানুষের ভীড় জমেছিল। জনতা ছিল ক্ষিপ্তপ্রায়। হযরত আহমদের সঙ্গী ছিল মাত্র ১২ জন, ঠিক যেমনটি ছিল বনী ইসরাইলী ঈসা (আ.) এর সঙ্গী ছিল মাত্র ১২ জন।

বাহাসে তারা হার মানতে বাধা হল। কেউই ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে তর্ক করতে অগ্রসর হল না। কেউ শপথও করল না; মৌলানা নযীর হোসেনও শপথ করলেন না বরং তারা গোলমাল শুরু করে দিল। অগত্যা পুলিশী হেফাযতে হযরত আহমদ বাড়ি ফিরে এলেন। এই তর্ক-যুদ্ধ আহমদীয়াতের ইতিহাসে 'দিল্লী মুবাহাসা' নামে খ্যাত।

১৮৯৩ সনে অমৃতসরে খৃস্টানদের সঙ্গে ১৫ দিন ধরে তর্কযুদ্ধ হয়। খৃস্টানদের প্রতিনিধি ছিলেন ডেপুটি আব্দুল্লাহ আথম। 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' নামক গ্রন্থে এই বাহাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পূর্বের বাহাসগুলিতে যেমন বিরুদ্ধপক্ষগুলি পরাজয় বরণ করেছিল এই বাহাসেও তেমনি খৃস্টানপক্ষ পরাজিত হয়েছিল। পরে, হযরত আহমদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আব্দুল্লাহ আথম মারা যায়। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কারণ আব্দুল্লাহ আথম হযরত রাসুলে করিম (সা.) কে 'দাজ্জাল' (নাউযুবিল্লাহ্) বলেছিল।

অতঃপর হযরত আহমদ ফিরোজপুর যান। বলাবাহুল্য, কোথাও তাঁকে অহেতুক অপদস্থ করার জন্যে আয়োজনের ত্রুটি হয়নি।

হযরত আহমদ ১৮৯৬ সনে জুমুআ নামাযের জন্যে শুক্রবারকে ছুটির দিন ঘোষণা করার জন্য আন্দোলন করেন। উল্লেখ্য, এই সময়ে হিন্দুস্থানে জুমুআ নামায ফরয কিনা এই নিয়ে আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে হযরত আহমদ জুমুআ নামাযকে এক নবজীবন দান করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্য আসমানী নিদর্শন স্বরূপ হাদিস শরিফে একই রমযান মাসে যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা সংঘটিত হয় ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ সালে যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে। এই পরম বিস্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা নিরঙ্কুশভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে, তেমনি অপরদিকে, হযরত 'খাতামান্নাবীঈন' মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সত্যতাও সমগ্র জগদ্বাসীর সামনে মধ্যাহ্ন গগণের সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

লাহোর সর্ব ধর্ম সম্মেলন

এই বৎসর লাহোরে একটি সর্ব-ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিকে নিম্নলিখিত বিষয় পাঁচটির উপরে প্রবন্ধ পাঠের জন্য আহ্বান করা হয়:

(১) মানবের শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কি?

(২) মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কি?

(৩) পৃথিবীতে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি এবং তা কি উপায়ে সাধিত হতে পারে?

(৪) মানুষ ইহলোকে এবং পরলোকে কিরূপে কর্মফল ভোগ করবে?

(৫) কি উপায়ে ঐশী জ্ঞান লাভ করা সম্ভব?

এই শর্তে সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থ থেকে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন, কেউ অপরের ধর্মমতের উপরে অযথা আক্রমণ করবেন না।

উপরোক্ত সম্মেলনে পাঠ করার জন্য হযরত আহমদ (আ.) একটি প্রবন্ধ লিখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রবন্ধ রচনা করার সময়ে তিনি পীড়িত হয়ে

পড়েন, কিন্তু লেখার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এই অবস্থায় তাঁর প্রতি এই মর্মে ইলহাম হলো যে, 'তোমার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট হবে।' তিনি তৎক্ষণাৎ তা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচারও করেন। অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে সম্মেলনে না গিয়ে মৌলভী আবদুল করীম নামক শিষ্যকে তাঁর প্রবন্ধ পাঠের জন্য পাঠিয়ে দেন। সভার তারিখ ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯৬। তাঁর রচনা পাঠের সময় ছিল ২৭শে ডিসেম্বর। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রথম প্রশ্নের উত্তরই শেষ হলো না।

তখন সিয়ালকোটের মৌ. মোবারক আলী সাহেব তাঁর জন্য নির্ধারিত সময় এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য ছেড়ে দেন। বেলা ৫-৩০ মিনিটে প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়। শ্রোতাদের অনুরোধে সম্মেলনের তারিখ আরও একদিন বাড়িয়ে দেয়া হলো যাতে এই প্রবন্ধ পাঠ শেষ হতে পারে। পরদিন সভার অধিবেশনের আধ ঘন্টা পূর্বেই শুরু করা হলো। এই প্রবন্ধের উৎকর্ষতার কথা শুনে লোকেরা দলে-দলে সম্মেলনে যোগ দিল। রচনা পাঠের সময় আবারও বাড়ানো হলো। লাহোরে হুলস্থুল পড়ে গেল। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলো, মির্যা সাহেবের প্রবন্ধই সর্বোৎকৃষ্ট। উপস্থিত সকল ধর্মাবলম্বী লোক এই রচনার অনবদ্য সৌন্দর্যের ও সুগভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা অকপটে অবনত মস্তকে স্বীকার করলো। বিরোধীপক্ষের সংবাদপত্রগুলিও এই রচনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করলো। মির্যা সাহেবের এই বিজয় শত্রুদেরও প্রভাবান্বিত করলো। এই প্রবন্ধ পরে পুস্তকাকারে প্রকশিত হয়, যার নাম 'ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী'। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ হয়েছে এবং এর সমাদর দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলায় অনুদিত এই পুস্তকটির নাম 'ইসলামী নীতি দর্শন।

কুরআন করিমের দুই শতাধিক আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্বলিত এই গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিমতগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

Count Tolstory: "The ideas are very profound and very true."

The English Mail: "A summary of really Islamic ideas."

Theosophical Book

Notes: "Admirably calculated to appeal to the student of comparative religion, who will find exactly what he wants to know as to Mohammedan doctrines on soul and bodies, divine existence, moral law and much else."

The Brinton Times and Mirror: "Clearly it is no ordinary person who thus addresses himself to the West"...

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি খৃস্টানদের সম্বোধন করে বলেন, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাঁর নিজের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ থেকে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠতর, তাহলে তাঁকে তিনি এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। কিন্তু কেউ মোকাবেলা করতে সাহস করেনি।

এই বৎসর ৬ই মার্চে, পন্ডিত লেখরাম নামক আর্য সমাজের জনৈক নেতা হযরত আহমদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক মৃত্যুবরণ করে। এতে তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু তিনি বেকসুর প্রমাণিত হন। মে মাসে (১৮৯৭) তুর্কী কনসাল হোসেইন কামী কাদিয়ানে এসে হযরত আহমদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তুরষ্ক সালতানাতের জন্যে দোয়ার আবেদন জানান। তাকে হযরত আহমদ (আ.) বলেন:

> **"তুরষ্কের সুলতানের রাজত্বের অবস্থা ভাল নয়। আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তাঁর রাজ্যের প্রশাসকদের অবস্থা ভাল নয় এবং আমার নিকট এর পরিণাম ভাল বোধ হচ্ছে না।"- এই কথা শুনে তুর্কী দুত অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যান এবং লাহোরের এক সংবাদপত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে গালিগালাজ করে পত্র লিখেন। এতে**

তিনি ভারতের মুসলমানদেরকেও ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতিহাস মসীহ মাওউদ (আ.) এর পক্ষে সাক্ষ্য দান করেছে। উল্লেখ্য যে, পরে ঐ তুর্কী কনসাল এবং ঐ সংবাদপত্র আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় শাস্তি প্রাপ্ত হয়। কেননা, আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহকে বলেছেন, "ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা এহানাতাকা"- যে তোমাকে অপমান করতে চাইবে, আমি তাকে লাঞ্ছিত করবো।"

ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমা

১ লা আগস্ট, ১৮৮৭ তারিখে ড. মার্টিন ক্লার্ক নামক জনৈক পাদ্রী অমৃতসরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে এক খুনের মোকদ্দমা দায়ের করে। অভিযোগ আনা হয়, উক্ত পাদ্রীকে খুন করার জন্য মির্যা সাহেব আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল হামিদকে খৃস্টান মিশনে রাখা হতো। তার জবানবন্দীতে প্রচুর গরমিল লক্ষ্য করে তাকে মিশন থেকে সরিয়ে পুলিশ হেফাযতে আনা হয়। জেরার সময় সে কেঁদে উঠে এবং ক্ষমা লাভের প্রতিশ্রুতি না পেয়েও স্বীকার করে, 'আমাকে ভয় দেখিয়ে এসব জবানবন্দী দিতে বাধ্য করা হয়েছে। আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি আত্মহত্যা করবো। ইত্যাদি।' এই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ম্যাজিস্ট্রেট হযরত আহমদকে বেকসুর মুক্তি দেন। এই মিথ্যা মোকদ্দমায় হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান একত্র হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লেগেছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা এই মোকদ্দমার বিচারক কাপ্তান এম. ই. ডব্লিউ. ডগলাস হযরত ঈসা (আ.) এর বিচারক পীলাতের চাইতেও বেশি সৎ-সাহস দেখিয়েছিলেন। ইহুদীদের সেই মিথ্যা মোকদ্দমায় ঈসা (আ.)-কে সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও পীলাত তাঁকে ক্রুশে লটকাবার জন্য ইহুদীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ঈসা (আ.) এর রক্তপাতে তিনি দায়ী নন, এটা বোঝাবার জন্য বলেন 'I wash my hand' – এবং হাত ধুয়েও ফেলেন। পক্ষান্তরে কাপ্তান ডগলাস বার বার বলেছেন, 'আমি বেইমানী করতে পারব না।' তিনি পাদ্রীদের চাপের মুখে মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দুশমনের হাতে তুলে দেননি; বরং নির্দোষ প্রমাণিত করে মুক্তি

দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি এটাও প্রমাণ করেছেন যে, রোমের শাসন থেকে বৃটিশ শাসন উন্নত ছিল।

তাঁর জীবনের আরও কিছু ঘটনা

এই সময়ে মসীহ মাওউদ (আ.) 'সোলেহ খায়ের' নামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। এতে তিনি মুসলমান উলামাদের কাছে এই আবেদন করেন, তাঁরা যেন তাঁর বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকেন এবং তাঁকে বিধর্মীদের সাথে মোকাবেলা করার সুযোগ ও অবকাশ দেন। কিন্তু মুসলমান আলেমরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি।

অক্টোবর মাসে তিনি মুলতান যান এবং ফেরার পথে লাহোরে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এ সময় লাহোরে প্রায় সর্বত্র তাঁর বিরোধিতা হয়েছিল।

এই বৎসর পাঞ্জাবে প্লেগের প্রার্দুভাব ঘটে। মহামারী নিবারণের জন্য সরকার যে বিধি-নিষিধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে, সকল ধর্মের লোকেরাই তার বিরুদ্ধে চলতে থাকে এবং সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকে। হযরত আহমদ বলেন, ইসলামের হুকুম হচ্ছে,- 'স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল বিধি-ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তা পালন করা সকলের কর্তব্য।' তবে তিনি আহমদীদের প্লেগের টিকা নিতে বারণ করেন এবং বলেন, তাঁর দাবির সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ খোদা আহমদীদের এই ভয়ংকর মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করবেন। এই প্লেগে পাঞ্জাবে অন্তত দুই লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু, খোদার ফযলে কোন আহমদী মুসলমান মারা যায়নি।

এই সময়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সুযোগে বিপ্লববাদীরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছিল। এই কারণে সরকার রাজদ্রোহমূলক 'সিডিশান আইন' (১৮৯৭) পাশ করে। কিন্তু, এই আইন দ্বারা ধর্ম-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদের প্রতিরোধ করা হয়নি। ভারতবর্ষে অশান্তির মূল কারণ যে ধর্মীয় কোন্দল গভর্ণমেন্ট তা উপলব্ধি করতে

পারেনি। ফলে, এই আইন ততটা কার্যকরী হয়নি।

সেপ্টেম্বর মাসে মসীহ মাওউদ (আ.) তদানীন্তন বড় লাটের কাছে একটি মেমোরেন্ডাম প্রেরণ করেন। তিনি বলেন যে, ধর্মীয় মতভেদই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক কলহের মূল কারণ। ধর্মীয় উত্তেজনাকেই পরিণামে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করেন,

প্রথমত:- 'এমন একটি আইন হওয়া চাই, যার আওতায় প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় কেবল নিজ-নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারবে, কিন্তু অপর কোনও ধর্মকে আক্রমণ করতে পারবে না। এরূপ আইনের ফলে, ধর্মীয় স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপও হবে না, বিশেষ কোন ধর্মমতকে সমর্থনও করা হবে না; অন্য ধর্মকে আক্রমণের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হলো বলেও কেউ আপত্তি করতে পারবে না।'

দ্বিতীয়ত:- 'যদি উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত না হয়, তাহলে অন্তত এতটুকু যেন করা হয় যে,- এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের উপর এমন কোনও বিষয়ে দোষারোপ করতে পারবে না, যা তার নিজের ধর্মের মধ্যেও আছে।'

তৃতীয়ত:- 'যদি এই প্রস্তাবটিও গৃহীত না হয়, তাহলে কম পক্ষে এতটুকু যেন করা হয় যে, সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ধর্মের প্রাথমিক গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা হোক এবং এই আদেশ দেয়া হোক যে, কেউ কোন ধর্মের সমালোচনা করতে চাইলে তার সমালোচনা উক্ত তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, মূল ধর্মগ্রন্থ বহির্ভূত প্রচলিত কিচ্ছা-কাহিনীর উল্লেখ ও আলোচনার দরুণই বিরোধের সৃষ্টি হয়, হিংসা-কলহ অনিবার্য হয়ে ওঠে।' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গভর্ণমেন্ট তাঁর এই অভিমত উপলব্ধি করতে বিলম্ব ঘটায় এবং ১৯০৮ সালে অনুরূপ এক আইন পাশ করে। ফলে, এর কার্যকারিতা সন্তোষজনক হয়নি।

ধর্ম এ দেশবাসীর নিকট অতীব প্রিয়। যদি কেউ কারও ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসিতভাবে আক্রমণ চালায়, তাহলে জনসাধারণকে ক্ষেপাবার জন্যে এতটুকু

বললেই যথেষ্ট হয় যে, 'গভর্ণমেন্টের সকল দোষ। গভর্ণমেন্টের প্রশ্রয় না পেলে এমনটি ঘটতেই পারতো না।'

১৮৯৮ সনে জনৈক ইসলামত্যাগী খৃস্টান হযরত রাসুলে করিম (সা.) এর পবিত্র সহধর্মীণিগণের বিরুদ্ধে একটি বিদ্বেষপূর্ণ মর্মঘাতী পুস্তক প্রকাশ করে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করার জন্য লাহোরের একটি আঞ্জুমান সরকারের কাছে মেমোরেন্ডাম পেশ করে। হযরত মির্যা সাহেব পরামর্শ দিলেন, প্রথমে উক্ত পুস্তকটির জবাব দান করতে হবে; পরে এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সরকার তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে। মুসলমানদেরও পুস্তক লিখবার অধিকার সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১৮৯১ সালে তিনি কাদিয়ানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ সালে তা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত উন্নীত হয়।

১৮৯৯ সনে বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করে ব্যর্থ হয়।

১৯০০ খৃস্টাব্দে তিনি খোদায়ী ফয়সালার জন্য লাহোরের বিশপের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু বহু পত্র-পত্রিকার অনুরোধ সত্ত্বেও, বিশপ ঐরূপ ঐশী মীমাংসার সম্মুখীন হতে সাহস করেননি।

১৯০১ সালের আদমশুমারীতে তিনি জামা'তের সবাইকে 'আহমদী মুসলমান' বলে পরিচয় লিখবার আদেশ দেন।

এই সময় তাঁর বিরোধী আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর বাড়ির মসজিদের দরজার সামনে এক প্রাচীর তুলে দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তিনি মামলা করলে ঐ দেয়াল ভেঙ্গে দেয়া হয়। মামলার খরচ (বহনের জন্য-চলতিকারক) বিরোধী পক্ষের উপর ডিক্রি হয়। কিন্তু, তিনি তা গ্রহণ করেননি।

১৯০২ সালে তিনি 'রিভিউ অফ্ রিলিজিয়নস্' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। অদ্যাবধি ঐ পত্রিকার ইংরেজি ও উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। অধুনা The London Mosque, 16, Gressenhall Road, London,

SW18, 5QL, U.K. থেকে এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য জগতেই এর প্রচার সমধিক।

১৯০২ সালে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে তিনি খোদাতায়ালার আদেশে 'আরবি ভাষায়' একটি অনবদ্য ও অনুপম বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতা দানের সময় তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে ঐশী-জ্যোতির বিস্ময়কর বিচ্ছুরণ ঘটছিল। তাঁর দেহ মুবারক ইলাহী নূরের তজল্লীতে অনুক্ষণ উদ্ভাসিত হচ্ছিল। এই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে 'খুতবায়ে ইলহামিয়া' শিরোনামে। আসলে এই খুতবাটি আগাগোড়াই ইলহাম বা ঐশী বাণী।

এই বৎসর তিনি আরবি ভাষা শিক্ষার উপরে বিশেষ গুরুত্বরোপ করেন। তিনি মাতৃভাষার সঙ্গে আরবি ভাষা শিক্ষারও সহজ উপায় নির্ধারণ করেন। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের ধর্মের ভাষা জানে না, সে কখনও তাঁর ধর্মকে ভালভাবে জানতে পারে না। অনুবাদ কখনই মূলগ্রন্থের সমতুল্য হতে পারে না। এক্ষেত্রে জামা'ত এখন সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

"প্রতিশ্রুত মসীহ দামেস্কের পূর্ব দিকে শ্বেত মিনারের উপরে অবতীর্ণ হবেন"- হাদিস শরিফের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আক্ষরিক অর্থেও পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০২ সালে কাদিয়ানে এক মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন। অবশ্য, এই ভবিষ্যদ্বাণীর তা'বির বা তাৎপর্য হচ্ছে-মসীহ মাওউদ পরিষ্কার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণসহ আবির্ভূত হবেন। সারা দুনিয়ায় তাঁর বিজয়ের গৌরব প্রকাশিত হবে। পূর্বদিকে আগমন করার অর্থ হচ্ছে, এরূপ উন্নতি–যাতে কেউ বাধা দান করে কৃতকার্য হতে পারবে না। হাদিসের এই ভবিষ্যদ্বাণী দিনে-দিনে প্রতিপন্ন হচ্ছে। এই বছরেই করমদীন নামক এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে ঝিলমের আদালতে একটি ফৌজদারী মামলা রুজু করে। ১৯০৩ সালে জানুয়ারি মাসে তিনি ঝিলম যান। প্রকৃতপক্ষে এই সফর থেকেই সূচিত হয় তাঁর প্রকাশ্য সফলতা। ঝিলম স্টেশনে পৌঁছার পূর্বেই সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। স্টেশন ও স্টেশনের বাইরে রাস্তা-পথে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। লোক চলাচলের কাজে পুলিশকে সহায়তা করতে হয়। সুদূর গ্রাম-গঞ্জ থেকেও হাজার-হাজার মানুষের সমাগম হয়। এই সময় প্রায় এক হাজার লোক

তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। মামলার প্রথম দিনেই তিনি বেকসুর খালাস পান।

১৯০৩ থেকে তাঁর সাফল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিদিন দীক্ষা গ্রহণের জন্য শত-শত চিঠি আসতো। দেখতে-দেখতে তাঁর মুরীদানের সংখ্যা হাজার থেকে লক্ষে পৌঁছে গেল। তবে এই বৎসর একটি নিদারুন মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে। কাবুলে হযরত সৈয়দ আবদুল আবদুল লতীফ (রা.)-কে আহমদীয়াত গ্রহণ করার কারণে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

এই সময়ে পুনরায় মসীহ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে চারদিক থেকে নানা প্রকার মোকদ্দমা দায়ের হতে থাকে। করমদীন আবারও গুরুদাসপুর জেলায় মোকদ্দমা করে। এই মোকদ্দমা দীর্ঘদিন চলে। তাই হযরত আহমদ (আ.)-কে গুরুদাসপুরেই বসবাসের ব্যবস্থা করতে হয়। মোকদ্দমা ছিল মাত্র ৩/৪ শব্দের অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে। করমদীন হযরত সাহেব সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছিল। তাই তিনি ঐ ব্যক্তিকে কাজ্জাব ও 'লয়ীম' বলেছিলেন। কাজ্জাব অর্থ মিথ্যাবাদী, 'লয়ীম' ছিদ্রান্বেষী, ইতর। এই মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেটও করমদীনের পক্ষে ছিল। তাই জনবর ছিল যে, এবারে মির্যা সাহেবের নিস্তার নেই। শাস্তি হবেই। এসব কথা কোন শিষ্য তাঁকেও একবার জানান। তিনি তখন শোয়া অবস্থায় ছিলেন। শোনামাত্র তিনি এক হাতের উপর ভর দিয় উঠে বসেন। তাঁর চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে। তখন বজ্রস্বরে তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়: "কী, এই ব্যক্তি খোদাতায়ালার সিংহের গায়ে হাত তুলতে চায়? যদি তাই করে, তবে দেখতে পাবে তার পরিণাম কি দাঁড়ায়।" বলাবাহুল্য ঐ ম্যাজিস্ট্রেট শাস্তি প্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হয়। পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। বহুদিন শুনানীর পর সে দুইশত টাকা জরিমানা করে। এর বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। আপীলে হযরত সাহেবের জয় হয়। বিচারক আপীলের বিবরণীতে মামলায় দীর্ঘ সময় নেয়ার জন্য এবং অন্যায় রায় দেয়ার জন্য পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেটদের কড়া সমালোচনা করেন। এই মোকদ্দমা ও তার ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পূর্বেই ওহী বা ঐশী-বাণীর দ্বারা তাঁর মসীহকে অবহিত করেছিলেন।

১৯০৪ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লাহোর সফরে যান। এই সফরে তিনি ১৫ দিন লাহোরে ছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। বিরুদ্ধবাদীরাও তৎপর হয়ে উঠে। তারা তাঁর বাড়িতে ঢোকারও চেষ্টা করে। এবারেও এক বক্তৃতা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আবদুল করীম সাহেব বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি পরে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। বিরুদ্ধবাদীরা সভাকক্ষের বাইরে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঘোলাটে করার পাঁয়তারা করছিল। পুলিশ তা জানতে পেরে অশ্বারোহী দেহরক্ষীর সহায়তায় তাঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

২৭ শে অক্টোবর হযরত সাহেব (আ.) সিয়ালকোট গমন করেন। প্রতিটি স্টেশনে অভূতপূর্ব অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়। এ ছিল তাঁর জন্য অসাধারণ সাফল্য। বিশেষত সিয়ালকোট স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী এক মাইল এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। রাস্তার দুই ধারে, দরজায়, ঘরের জানালায়, ছাদে প্রচন্ড ভীড় জমেছিল। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যার পর তারা ল্যাম্প, মশাল জ্বালিয়ে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। বহনকারী গাড়ি কাছে এলেই আলো তুলে তাঁকে দেখতো, তাঁর প্রতি পুষ্প বৃষ্টি ঝরাতো, পুষ্পমাল্য নিক্ষেপ করতো। সিয়ালকোটে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পাঁচ দিন ছিলেন। এখানেও একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। মৌলভীরাও ফেৎনা শুরু করে দেয়।

তারা ফতওয়া জারি করে, মির্যা সাহেবের বক্তৃতা যে শুনতে যাবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। তারা হযরত সাহেবের সভাস্থলের সম্মুখবর্তী স্থানে এক পাল্টা সভার আয়োজন করে। লোকজনকে বাধা দান করে। হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন হুযুর (আ.) সভাস্থলে এলেন, তখন মৌলভীদের লোকেরাসহ, সবই হুযুরের বক্তৃতা শোনার জন্য এই সভায় যোগদান করে। মৌ. আবদুল করীম সাহেব বক্তৃতা পাঠ করেন। সকলে আগ্রহভরে বক্তৃতা শুনে।

কিন্তু মৌলভীরা আবারও গোলমাল শুরু করে। একজন ইংরেজ পুলিশ অফিসার আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'তোমরা তো

মুসলমান, তোমরা তাঁর বক্তৃতা শুনে বিচলিত হও? তিনি তো তোমাদের কথাই বলছেন, তোমাদের নবীরই গৌরব বর্ণনা করেছেন। নারাজ হওয়ার কথা তো আমাদের। কেননা, তিনি আমাদের খোদার (যীশুর) মৃত্যুর প্রমাণ জোরেশোরে তুলে ধরছেন।' এই বক্তৃতা 'লেকচার সিয়ালকোট' নামে খ্যাত।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে মসীহ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন।

এই বৎসর তিনি দিল্লী যান এবং সেখানে ১৫ দিন অতিবাহিত করেন। দিল্লীতে এবারে পূর্বের ন্যায় এত বেশি গোলযোগ হয়নি। ফেরার পথে তিনি লুধিয়ানায় আসেন এবং সেখানে একটি বক্তৃতা করেন। এরপর অমৃতসর ছিল বিরুদ্ধবাদীদের আড্ডাখানা। এখানেও এক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। মৌলভীরাও নানা উপায়ে লোকজনকে উত্তেজিত করতে থাকে। বক্তৃতার সময় মিনিট পনর পরে এক ব্যক্তি হুযুরের সামনে এক পেয়ালা চা তুলে ধরে। গলায় ব্যথা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে মানা করেন। কিন্তু লোকটি চা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা হুযুর পেয়ালায় একটু চুমুক দেন। সময়টা ছিল রমযান মাস। যেই না তিনি চায়ে চুমুক দিয়েছেন আর এমনিই মৌলভীরা শোরগোল করতে শুরু করে। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, এই ব্যক্তি মুসলমান নয়, রমযান মাসে রোযা রাখে না ... ইত্যাদি। হযরত সাহেব তাদেরকে বললেন- 'রুগ্ন ও মুসাফের ব্যক্তির তো রোযা রাখতে নেই। আমি মুসাফের এবং অসুস্থ।' কিন্তু কে শোনে কার কথা? কে সামলায় ক্ষিপ্ত জনতাকে। পুলিশ শত চেষ্টা করেও শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারলো না। শেষে মারাত্মক আকার ধারণ করলে পুলিশী হেফাযতে গাড়িতে করে অজস্র ইট-পাথর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে হযরত সাহেব বাসায় ফিরে আসেন। খোদাতায়ালার কৃপায় হুযুর ও তাঁর সঙ্গীদের কারও কোন ক্ষতি হয়নি। পরদিন তিনি কাদিয়ানে চলে আসেন।

১৯০৫ এর ডিসেম্বর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উপরে ইলহাম হয় যে, তাঁর যাওয়ার সময় আগত; তাঁর মৃত্যুর সময় হয়ে এসেছে। এই সংবাদ তিনি 'আল ওসীয়্যত' নামক পুস্তকের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচার করেন; এবং স্বীয় জামা'তের লোকজনকে আশ্বস্ত করেন, সান্ত্বনা দেন। আল্লাহতায়ালার ইলহাম

অনুসারে তিনি একটি কবরস্থান নির্মাণের আদেশ দেন। এই কবরস্থানে জামা'তের সেইসব ব্যক্তিকে দাফন করা হয় যারা তাঁদের সম্পত্তির অন্তত এক-দশমাংশ ইসলামের খেদমতে ওসীয়্যতের মাধ্যমে দান করে যান। খোদাতায়ালা হুযুর (আ.)-কে এই শুভ সংবাদ দিয়েছেন, এই কবরস্থানে কেবল সেই সকল ব্যক্তিই স্থান লাভ করবে যারা জান্নাতের অধিকারী। এই কবরস্থানের নাম 'বেহেশতি মাকবেরা।' ওসীয়্যতের মাধ্যমে প্রদত্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুযুর (আ.) একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯০৬ সালে হুযুর বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটিগুলির সমন্বয়ে 'সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া' নামে একটি আঞ্জুমান গঠন করেন।

ঐশী-বাণী মোতাবেক হুযুর (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাঁর ইন্তেকালের পর খেলাফত প্রতিষ্ঠা হবে, এবং তা খোদাতায়ালার 'দ্বিতীয় কুদরত' রূপে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। হাদিস শরিফে এসেছে, হযরত রাসুল করিম (সা.) বলেছেন, আখেরী জামানায় 'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াত' অর্থাৎ, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। কুরআন মজিদে সুরা নুরে সৎকর্মশীল মুমিনদের মধ্যে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে, তা-ই বর্তমানে নিখিল বিশ্ব জামা'তে আহমদীয়ার খিলাফত, অর্থাৎ নব পর্যায়ে ইসলামী খিলাফত। এছাড়া অন্য কোনও ইসলামী খিলাফত নেই, থাকবেও না, কেয়ামত পর্যন্ত না।

১৯০৭ সালে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আহমদ (আ.) এর এক শিশুপুত্র মোবারক আহমদের মৃত্যু হয়।

এই বৎসর আমেরিকা থেকে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য কাদিয়ানে আগমন করেন। তিনি (আ.) তাদের হযরত ঈসা (আ.) এর দ্বিতীয় আগমনের গূঢ় তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন। ডিসেম্বর মাসে আর্য সমাজীরা লাহোরে এক সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে যোগদানকারী সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্যই এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, কেউ অপর কোন ধর্মকে আক্রমণ করে কোন বক্তব্য রাখতে পারবে না। কিন্তু, আর্যসমাজীরা নিজেরাই তাদের এই শর্ত এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

১৯০৮, ৩১ শে মার্চ পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের ফিন্যান্স কমিশনার স্যার উইলসন স্বয়ং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। আলোচনার মধ্যে রাজনীতির বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় 'মুসলিম লীগ' স্থাপিত হয়েছে। খাজা কামাল উদ্দিন সাহেবও এই সংগঠনের একজন সদস্য ছিলেন। হুযুর তাঁদের কথাবার্তা শুনে মন্তব্য করেছিলেন "আমি তো স্পষ্ট অনুভব করছি যে, মুসলিম লীগও কালে কংগ্রেসের রূপ ধারণ করবে। আমি এভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়াকে বিপজ্জনক মনে করি।"

এই বৎসর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর আম্মাজানের [অর্থাৎ হুযুর (আ.) এর সহধর্মিণীর (রা.)] অসুস্থতার কারণে হুযুরকে লাহোর যেতে হয়। সেখানে পৌঁছতেই বিরুদ্ধাবাদী মৌলভী-মোল্লারা তুমুল আন্দোলন শুরু করে দেয়। তারা সভাসমিতি করা শুরু করে। আহমদীদের নানাভাবে জব্দ ও উত্যক্ত করতে থাকে। তথাপি প্রতিদিন বহু লোক তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাত করতে থাকে। তিনি একদিন লাহোরের সম্ভ্রান্ত গয়ের-আহমদী ব্যক্তিদের দাওয়াত করেন। ভোজের পূর্বে তিনি এক বক্তৃতা আরম্ভ করেন। বক্তৃতা কিছু লম্বা হয়ে পড়ে। অভ্যাগতদের মধ্যে এক ব্যক্তির কিছুটা বিচলিতভাব দেখে অন্যান্যরা মন্তব্য করেন "খানা-পিনা তো রোজই হয়ে থাকে, কিন্তু এই ধরনের আধ্যাত্মিক খানাপিনা তো কেবল আজই আমাদের ভাগ্যে ঘটলো।" পরদিন এই বক্তৃতা সম্পর্কে গুজব রটে, মির্যা সাহেব তাঁর নবুওয়াতের দাবি প্রত্যাহার করেছেন। লাহোরের কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রেও এই ধরনের খবর ছাপা হয়। হযরত সাহেব (আ.) তখন ঐ সংবাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করেন এবং বলেন, তিনি কখনও তাঁর নুবওয়াতের দাবি প্রত্যাহার করেননি। তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, তিনি কোনও শরীয়ত আনয়ন করেননি। শরীয়ত তা-ই আছে ও থাকবে–যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আনয়ন করেছেন। অর্থাৎ, তিনি মুহাম্মদী শরীয়তের অধীনে একজন উম্মতি নবী মাত্র।

ইন্তেকাল

হযরত আহমদ প্রায়শ পেটের অসুখে ভুগতেন। দাস্ত হতো। লাহোরে আসার পর তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার মধ্যে একদিন ইলহাম হয়- "আর রাহিল সুম্মার রাহিল" (যাওয়ার সময় আগত, যাওয়ার সময় আগত)। এই ইলহাম স্বয়ং হুযুর (আ.) এর জন্যই জানতে পেরে তাঁর সহধর্মিণী (রা.) তাঁকে নিয়ে কাদিয়ানে ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেন- "এখন কাদিয়ানে ফিরে যাওয়া আমার সাধ্যাতীত।"

আশ্চর্য যে, এরূপ অবস্থার মধ্যেও তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও সৌ-ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দিবেন বলে স্থির করেন এবং সেজন্য একটি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। এই প্রবন্ধটির নাম 'পয়গামে সুলেহ' বা শান্তির বাণী। যেদিন প্রবন্ধ লেখা শেষ হয় সে দিন ইলহাম হয়- "মাকুন তাকিয়া বর উমরে না পায়দার" (ভঙ্গুর জীবনের উপর ভরসা করো না)। রাত্রে আবারও দাস্ত হতে থাকে। ডাক্তার ডাকা হলো। কয়েকটি ইনজেকশান দেয়া হলো। কোনও কাজ হলো না। ফযর নামাযের সময় হলে তিনি উঠে নামায পড়লেন।

তাঁর গলা একদম বসে গিয়েছিল। কিছু বলতে চাইলেন, পারলেন না। কাগজ কলম আনতে বললেন, কিন্তু কিছুই লিখতে পারলেন না। কলম হাত থেকে পড়ে গেল। শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাঁর পবিত্র আত্মা সেই রাজাধিরাজের দরবারে উপস্থিত হলো–যাঁর ধর্মের সেবায় তাঁর সারাটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে- ' ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।' শেষ অসুখের সময়ে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে শুধু একটি শব্দই উচ্চারিত হতো এবং ঐ শব্দটি ছিল- 'আল্লাহ্'।

পরদিন সারা হিন্দুস্থানের পত্র-পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলো। বন্ধুরা শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হলেন। শত্রুরা আনন্দে উল্লসিত হলো। প্রথম মসীহের শিষ্যরা তাদের প্রভুকে ক্রুশের উপর থেকে জীবিতাবস্থায় নামিয়ে আনতে দেখে হতভম্ব হয়েছিল, আর দ্বিতীয় মসীহের শিষ্যগণ বিহ্বল হয়ে

পড়লো তাঁদের মসীহকে মৃত্যু বরণ করতে দেখে।

"তাঁর লাশ কাফনে জড়িয়ে কাদিয়ানে আনা হয়েছে" কিছুকাল পূর্বের এই ইলহাম পূর্ণ হলো। বিভিন্ন জামা'তের শত-শত প্রতিনিধি কাদিয়ানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত আলহাজ মাওলানা হেকিম নুরুদ্দিন সাহেবকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর খলিফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বয়াত (দীক্ষা গ্রহণ) করলেন। 'আল্ ওসীয়্যত' গ্রন্থে হুযূর (আ.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, এখন তা পূর্ণ হলো। খলিফা তাঁর নামায-এ-জানাযা পড়ালেন। দুপুরের পর তাঁর দাফন সম্পন্ন হলো।

তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজি ও বিভিন্ন দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহে ঘোর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করা হলো যে, বর্তমান যুগে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একজন মহাপুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হয়। এখানে একটি মাত্র অভিমতের কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত আলেম ও জাতীয়তাবাদী নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছিলেন:

"তিনি (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ- [আ.]) এক অতীব মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল মূর্তিমান বিস্ময়। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ; কণ্ঠস্বর কেয়ামত সদৃশ। তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হতো। তাঁর দু'টি মুষ্ঠি ছিল বিদ্যুতের তরঙ্গের মত। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবত ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয় বিষাণে নিদ্রিতকে জাগ্রত করতেন। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। ..."

(অমৃতসর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'উকিল', ২০শে জুন, ১৯০৮)।

আহমদীয়া জামা'তে বয়াত গ্রহণের শর্তাবলী

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

১। এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতায়ালার অংশীবাদিতা হতে পবিত্র থাকবে।

২। মিথ্যা, ব্যাভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন–তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রাসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে, রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করবে ও ইস্তেগফার পড়বে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হামদ (প্রশংসা) গাইবে।

৪। উত্তেজনার বশে, অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সাথে জীবন-যাপন করবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯। আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ, হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না। (ইশতেহার তকমিলে তবলিগ, ১২ই জানুয়ারি, ১৮৮৯ ইং)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম বিশ্বাস

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, তা-ই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ইমান রাখি, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ইমান রাখি, কুরআন শরিফে আল্লাহতায়ালা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা যাবতীয় সত্য। আমরা ইমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরিয়ত হতে বিন্দুমাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত, তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ইমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ইমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরিফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ইমান আনবে। নামায, রোযা, হজ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁর রাসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ, সর্ববাদিসম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মত মতে

ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহি আলাল কাযিবিনা ওয়াল মুফাতারিয়িন-"
অর্থাৎঃ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

The biography of Ahmad (as)

This is a brief life sketch of the Promised Messiah and Mahdi (as). His life reflected the attributes of his beloved mentor and master Hadhrat Muhammad (sa). He tried to follow the footsteps of his divine guide in every sphere of his life. This is an authentic narration of his holy life as it has been related by his illustrated son Al Muslehul Maud (ra).

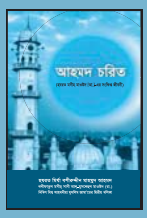

Ahmad Charito
by **Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad** [ra]
Khalifatul Masih II
published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-018-3
978 984 991 018 3